Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে কেনো এতো গুরুত্বপূর্ণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সিনথিয়ারা ফুল

রোলঃ 227020243

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে কেনো এতো গুরুত্বপূর্ণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সিনথিয়ারা ফুল

রোলঃ 227020243

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে কেনো এতো গুরুত্বপূর্ণ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সিনথিয়ারা ফুল, আইডিঃ 227020243 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে কেনো এতো গুরুত্বপূর্ণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

সিনথিয়ারা ফুল

আইডিঃ 227020243

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ফিলিস্তিনের ইতিহাস 5

ফিলিস্তিনে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায় 6

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেনো এতো গুরুত্বপূর্ণ 14

ফিলিস্তিনে বসবাসকারী বিভিন্ন নবী ও রাসূল 17

ফিলিস্তিনে হামাস 23

বর্তমান অবস্থা 23

আমাদের করণীয় 24

ভূমিকা

ফিলিস্তিন মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান।ফিলিস্তিনের ভূমি অসংখ্য নবী-রাসূলের স্মৃতিবিজড়িত, এর আশপাশে অনেক নবী-রাসূলের সমাধি রয়েছে। এটি দীর্ঘকালের ওহি অবতরণস্থল, ইসলামের কেন্দ্র এবং ইসলামি সংস্কৃতির চারণভূমি।এই অঞ্চলটি ইসলামের তৃতীয় পবিত্র শহর, জেরুযালেম, যেখানে আল-আকসা মসজিদ অবস্থিত। এখানে প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) রাত্রী যাত্রা (ইসরা ও মিরাজ) করেছিলেন, যা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা।

মুসলমানদের পবিত্র এ ভূমি ভাঙা-গড়ার সর্বশেষ পর্বে এখন ইহুদিদের দখলদারির করাল গ্রাসে আক্রান্ত।ফিলিস্তিনের মুক্তি এবং জেরুজালেম এর পবিত্র স্থানগুলো সুরক্ষা নিশ্চিত করা মুসলমানদের জন্য বড় একটি দায়িত্ব। এটি আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্বের অংশ।

ফিলিস্তিনের ইতিহাস

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীনতম সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে যদি কোন ভূখণ্ডকে নির্বাচন করা হয় তাহলে সেইটা হবে ফিলিস্তিন। যেখানে খ্রিস্টপূর্ব ৯ হাজার বছর পূর্বে মানুষ আবাদ করেছিল। যার ১০০০ বছর পর অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৮ হাজার বছর পূর্বে গড়ে ওঠে ‘আরিহা’ নামক এক নগরী। আরিহা নগরীর পতনের পর থেকে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি গোত্র ও অসংখ্য নবী রাসূলের পদচিহ্ন অঙ্কিত হয় এই জনপদে।

ফিলিস্তিনে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়

কেনানী সম্প্রদায়: ফিলিস্তিনের মাটিতে বসবাসরত সবচেয়ে পুরনো সম্প্রদায় এই কেনানী সম্প্রদায় যারা আনুমানিক চার হাজার পাঁচশো বছর পূর্বে আরব উপদ্বীপ হতে ফিলিস্তিনে আগমন করে। যাদের স্মৃতি চিহ্ন আজও বিদ্যমান।

ইয়াবুসি সম্প্রদায়: খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০সালে আরবের ইয়াবুসি সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে বসবাস শুরু করে। তাই এই শহরের প্রাচীন নাম হচ্ছে ইয়াবুস। আল কুদুস নগরী গড়ে ওঠার আগেই এই সম্প্রদায় বসবাস শুরু করে। যার কারণে আল কুদুস নগরীকে ইয়াবুসও বলা হতো।

ইবরাহীম (আ.): খ্রিস্টপূর্ব (২০০০-১৫৫০) এই সময়টি ফিলিস্তিনের ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগেই ইব্রাহিম আ. এর মাধ্যমে প্রথম তাওহীদের প্রকাশ ঘটে।
খ্রিস্টপূর্ব উনিশ শতকে তিনি ইরাক থেকে ফিলিস্তিনে আগমন করেন। ফিলিস্তিনে তখন ছিল হেকসোসদের শাসন আমল। তারা মূর্তিপূজারি ছিল, কিন্তু তারা ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাস করত। তাই তারা ইব্রাহিম আ. কে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ দেয় এবং তিনি জেরুজালেমে একটি উপাসনালয় গড়ে তোলেন যা পরবর্তীতে "বায়তুল মাকদিস" নামে পরিচিতি লাভ করে। হযরত ইব্রাহিম আ. এর ছেলে হযরত ইসহাক আ. সহ তার বংশপরম্পরা এই পবিত্র ভূমির পরিচর্যা করেন।

বনি ইসরাইল: হযরত ইসহাক আ. এর সন্তান ইয়াকুব আ.। তিনি ফিলিস্তিনের মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াকুব আ. এর আরেক নাম ইসরাইল আ., তার বংশধরকেই বনি ইসরাইল বলা হয়।
ফিলিস্তিনে তখনো হেকসোসদের শাসন আমল চলছিল। এক সময় সম্রাট আহমোস ফিলিস্তিনে আক্রমণ করেন ফলে হেকসোসরা পরাজিত হয়। সম্রাট আহমোস বনি ইসরাইলকে হেকসোসদের সহযোগী মনে করায় তাদের ওপর অনেক জুলুম নির্যাতন চলতে থাকে। এই নির্যাতন চলতে থাকে প্রায় 300 বছর পর্যন্ত। এমন অবস্থায় বনি ইসরাইল মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়।

মুসা (আ.): খ্রিস্টপূর্ব 1250 সালের দিকে মুসা আঃ তাদের কাছে প্রেরিত হন। মুসা আ. এর আগেই হারুন আ. এর জন্ম হয়।অনেক অত্যাচারী বাদশাগন শত শত বছর ধরে বনী-

ইসরাঈলদের ওপর বিভিন্নভাবে জুলুম নির্যাতন করতে থাকে। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে তারা লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে মিশরের সিনাই উপত্যকায় চলে আসে। সেখানে বনি ইসরাইল বিভিন্নভাবে হযরত মুসা আ. এবং হারুন আ. কে কষ্ট দিতে থাকে। আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলকে নিয়ে বায়তুল মাকদ্দিসে রওনা হন। সে সময় বায়তুল মাকদ্দিসে অত্যাচারী কেনানীদের বসবাস ছিল। ফলে বনি ইসরাইল শহরে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানায়। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার তাদের শাস্তি স্বরূপ তীহ প্রান্তরে পাগলের মত ঘুরতে থাকে। এ অবস্থায় হযরত মুসা আ. ইন্তেকাল করেন।

ইউশা (আ.) : হযরত মুসা আ. এর ইন্তেকালের পর আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১১৯০ সালে ইউশা আ. বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেন। তখন কেনানিদের সঙ্গে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে বনি ইসরাইল বিজয় লাভ করেন এবং তারা সেখানে বসবাস করতে শুরু করে । ইউশা আ. এর জীবদ্দশায়ই বনি ইসরাইল অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ইউশা আ. এর ইন্তেকালের পর বনি ইসরাইলদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে পৌত্তলিকতা এবং তারা চরম অবাধ্যতায় পৌঁছে যায়। এমন অবস্থায় তাদের প্রিয় তাবুত, যার মধ্যে হযরত মূসা আ. এর লাঠি ছাড়াও আরো অনেক পবিত্র বস্তু ছিল সেগুলো তারা হারিয়ে ফেলে।

দাউদ (আ.): খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তালুত বনি ইসরাইলদের নেতৃত্বে আসেন। সে সময় ফিলিস্তিনদের সঙ্গে অনেক ভয়াবহ এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাদের সেনাপতি ছিলেন জালুত। যুদ্ধের এক পর্যায়ে দাউদ আ. জালুতকে হত্যা করেন। সে সময় দাউদ আ. এর বয়স ছিল ১৬ বছর। তালুতের ইন্তেকালের পর দাউদ আ. বনী ইসরাইলদের নেতৃত্ব দেন। তিনি ফিলিস্তিনে সবচেয়ে বড় ইহুদীবাদী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন, তা ছিল ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ৭৪% অঞ্চল। এটাই ছিল ফিলিস্তিনে ঈমান ও আহলে ঈমানের প্রথম আধিপত্য।

সুলাইমান (আ.): হযরত দাউদ আ. ফিলিস্তিনে চল্লিশ বছর শাসন করেন। তার ইন্তেকালের পর সুলাইমান আ. নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।তিনি বেশ দাপটের সাথেই শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তার প্রভাবে ইসরাইলিরা নুইয়ে পরলেও তার ইন্তেকালের পর ইহুদীরা আবার পুরনো চরিত্রে ফিরে যায়। তিনি বায়তুল মাকদ্দিস পুন:নির্মাণ করেন।সুলাইমান আ.ও ৪০ বছর শাসন করেন।সুলাইমান আ. ইন্তেকালের পর বনি ইসরাইল ১২টি গোত্রে বিভক্ত হয়ে পরে।একজনের নেতৃত্বে ১০ গোত্র একত্রিত হয়। বাকি দুই গোত্র একত্রিত হয় অন্য একজনের নেতৃত্বে। ১০ গোত্র ফিলিস্তিনের উত্তরে গড়ে তোলে ইসরাইলী সাম্রাজ্য। অন্য দুই গোত্র দক্ষিণ ফিলিস্তিনে গড়ে তোলে ইয়াহুযা সাম্রাজ্য। এরা ছিল ইয়াহুযা ও বিনইয়ামিনের

বংশধর। বিশৃঙ্খলা ও পৌত্তলিকতায় উভয় সাম্রাজ্যই বরাবর ছিল।মিশরের সম্রাট শিশাংক খ্রিষ্টপূর্ব ৯২০ সালে উত্তর অঞ্চলের ওপর হামলা করে দখল করে নেয়। আর ৭২১ সালে আ্যসিরিয়ানরা (আশুরিয়া) দক্ষিণ অঞ্চলের ওপর আক্রমন করে দখল করে নেয়। আর ধ্বংস হয়ে যায় ২০০ বছরের ইসরাইলি সাম্রাজ্য।

ফিলিস্তিনে বুখতে নসরের আক্রমণ : অ্যাসিরিয়ানরা ছিল ইরাকের অধিবাসী।খ্রিস্টপূর্ব ৭২১ এ তারা ইসরাইলী সাম্রাজ্যে হামলা করে। অধিকাংশ ইহুদিকে বন্দি করে পৃথিবীর নানান প্রান্তে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। এভাবে ইহুদীদের ১০ গোত্র ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইহুদিদের ইয়াহুযা সম্প্রদায় আরো ১৫০ বছর মাকদিস শাসন করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে ইরাকের সেনাপতি বুখতে নসর আবারও তাদের ওপর তাণ্ডবলীলা চালায়। ধ্বংস করে মসজিদে আকসা। প্রায় ৪০ হাজার ইহুদিকে বন্দী করে ইরাকে নিয়ে যায়। আর চিরতরে অবসান ঘটে ইহুদিবাদি সাম্রাজ্যের। ফিলিস্তিনে ইহুদিদের শাসনকাল ছিল মোট ৪১৮ বছর। যার মধ্যে ৮০ বছর ছিল দাউদ ও সুলাইমান আ.-এর ঈমানী শাসন। আর বাকি ৩৩৮ বছর ছিল ফিতনা -ফ্যাসাদ ও জুলুমণ্ডনির্যাতনে জর্জরিত।

ফিলিস্তিনে ব্যাবিলন ও পারসিক শাসন: ইয়াহুযা সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনে ব্যাবিলন শাসনের গোড়াপত্তন হয়। এ শাসন খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ থেকে ৫৩৯ পর্যন্ত ৪৭ বছর স্থায়ী হয়। তখন পারসিক ও ব্যাবিলনদের মাঝে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ ছিল চরম পর্যায়ে।পারসিকরা খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালে ইহুদিদের সহোযোগিতায় ফিলিস্তিনে আক্রমণ করে। ব্যাবিলনদের ব্যাবেল শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে গোটা ফিলিস্তিনকে পারসিকরা দখলে নেয়। পারসিকরা প্রায় ২০৭ বছর ফিলিস্তিন শাসন করে।

ফিলিস্তিনে রোমান শাসন : রোমান সেনাপতি আলেকজেন্ডার খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে পারসিকদের পরাজিত করে।তারাও মুশরিক ছিল।ইহুদিরা পারসিকদের থেকে ভালো সুবিধা না পাওয়ায় রোমানদের যুদ্ধে সার্বিক সহোযোগিতা করে। এমনকি কোনো কোনো ইহুদি রোমানীয়দের ধর্মও গ্রহণ করে। রোমানরা ফিলিস্তিন বিজয়ের পর সর্বপ্রথম তাকে রোমের অধীনে নিয়ে আসে। যা পরবর্তী সপ্ত শতাব্দীকাল পর্যন্ত বাইজেন্টাইনের অধীনে ছিল।রোমানরা খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ সাল থেকে ৬৩ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিন শাসন করে।

ফিলিস্তিনে ঈসা (আ.) : ফিলিস্তিনে রোমানীয়দের শাসনকালেই ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পর থেকে ৩০০ বছর পর্যন্ত ফিলিস্তিনে খুব কম মানুষই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।

৩২৪ ঈসাব্দে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। তাঁর মা আগেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে গোটা রোমান সাম্রাজ্যেই খ্রিস্টধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পৌত্তলিকরাও দলে দলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের চিন্তা-চেতনার প্রভাব খ্রিস্টধর্মেও পড়ে। যার ফলে খ্রিস্টধর্ম এক বিকৃত রূপ নিয়ে গোটা রোমান সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।ফিলিস্তিনিরা ৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ঈসা (আ.)-এর কুফুরীর অভিযোগ আনে। রোমান সম্রাট এ অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে শূলীতে চড়ায়।যা ইহুদি মতাদর্শে তাদের হাতে তার প্রাণ চলে যায়। অথচ বাস্তবতা এমন নয়। বরং আল্লাহ কুদরতিভাবে তাকে উর্ধ্ব আকাশে নিয়ে গেছেন।

ফিলিস্তিনে রোমান শাসন ৩১২ বছর স্থায়ী ছিল। একেবারে মুসলমানদের ফিলিস্তিন বিজয়ের আগ পর্যন্ত।

ইহুদিদের বিদ্রোহ: হজরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রায় ১০০ বছর পর আবারও শুরু হয় ইহুদিদের বিদ্রোহ। ১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বারবুখা-এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ শুরু হয়। তবে রোমান সম্রাট হাদ্রিয়ানের আক্রমণে ইহুদিরা দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করে। আর হাদ্রিয়ানের সেনাবাহিনী দখলে নেয় আল কুদসের পুরো ইহুদি অঞ্চল। চালায় ধ্বংসের স্ট্রীমরোলার। এ ঘটনার পর থেকে ইহুদিরা আর কখনোই বিদ্রোহের চেষ্টা করেনি। তখন থেকে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আল-কুদস রোমানদের অধীনেই থাকে।

মুসলিম শাসন: ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে হজরত উমর (রা.) খেলাফত কাল চলছিল। সেই সময় পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে উড়ছিল মুসলিমদের বিজয় ধ্বনি। মুসলিম বাহিনীর ইয়ারমুক বিজয়ের কারণে গাজা, নাবলুস, লদ, ইয়াফা ও রাফাহসহ কুদসের অন্যান্য অঞ্চলও বিজিত হয়। আল কুদসের অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রোমান খ্রিষ্টানরা। দীর্ঘ ৪ মাস অবরোধের পর মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হন। তখন জেরুজালেমের বিশপ সফরোনিয়াস উমর (রা.) কাছে কুদসের চাবি প্রদানের শর্তারোপ করেন। অতঃপর উমর (রা.) নিজে ফিলিস্তিনে আগমন করেন এবং খ্রিষ্টানদের সঙ্গে নিম্ন লিখিত দু'টি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন :

এক. খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন গির্জাঘর ও উপাসনালয় নিরাপত্তা পাবে।

দুই. এই পবিত্র শহরে কোনো ইহুদি বসবাস করতে পারবে না। সেই ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র 'আহদিয়ায়ে উমরিয়্যাহ' নামে বিখ্যাত।চুক্তিনামাটি আলকুদসের কিয়ামাহ গির্জায় আজও সংরক্ষিত আছে।

১৯ হিজরীতে মুআবিয়া রা.-এর হাতে কায়সারিয়া জয়ের মধ্য দিয়ে গোটা ফিলিস্তিন মুসলমানদের হাতে চলে আসে। মুসলমানদের আগমনের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।হজরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) ছিলেন শামের প্রথম মুসলিম গভর্নর। তখন ফিলিস্তিনও শামের অংশ ছিল। **১৮** হিজরীতে আমওয়াস মহামারিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তারপর মুআয ইবনে জাবাল (রা.) গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনিও মহামারিতে ইন্তেকাল করেন। তারপর গভর্নর নিযুক্ত হন ইয়াযীদ ইবনু আবু সুফিয়ান (রা.)। তিনিও মহামারিতে ইন্তেকাল করেন। এরপর মুআবিয়া (রা.) গভর্নর নিযুক্ত হন। হজরত উসমান (রা.) খেলাফত কালে তিনিই পুরো শাম অঞ্চলের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। আর উসমান (রা.) খেলাফতের শেষের দিকেই ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

উমাইয়া ও আব্বাসী খেলাফত:মুআবিয়া রা.-এর মাধ্যমে উমাইয়া খেলাফতের [৪১-১৩২ হিজরী/৬৬০-৭৫০ ঈসাব্দ] সূচনা হয়। সেই সময়টা ছিল ফিলিস্তিনিদের উন্নতি ও অগ্রগতির বসন্ত কাল। **১২৯** হিজরি ভূমিকম্পে মসজিদে আকসার বিভিন্ন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন উমাইয়া খলিফার নেতৃত্বে দ্রুত মসজিদটির মেরামত করা হয়। **১৩২** হিজরি/ ৭৫০ ঈসাব্দে উমাইয়া খেলাফতের পতন ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসী খেলাফত। **১৩২**-৬৫৬ হিজরী পর্যন্ত ৫২৪ বছর এ খেলাফত স্থায়ী হয়। **১৩২**-২৪৭ হিজরী পর্যন্ত **১১৫** বছর ছিল আব্বাসী খেলাফতের সোনালী যুগ। আব্বাসী যুগে আল আকসার ঐতিহ্যের কার্যক্রম বেগবান হয়। খলিফা হারুনুর রশিদ ও তার ছেলে মাহদী এই মসজিদ পরিদর্শনে আসে।

ফিলিস্তিনে শিয়া শাসন: ১৩২-৬৫৬ হি: পর্যন্ত আব্বাসী শাসন থাকলেও তারা ২৪৭ হি: দুর্বল হয়ে পড়েন। আব্বাসীয়দের দুর্বলতাকে কাজে লাগায় উবায়দিয়রা। **৩৫৯** হিজরীতে উবায়দিয়ারা মিশর দখল করে। একই বছর তারা ফিলিস্তিন দখল করে।তারা ছিল নিকৃষ্ট শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী।প্রায় একশ বছর তারা মুসলিম বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে। তারা অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে সুন্নী আলেমদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে।উবায়দিয়াদের দখলের মধ্য দিয়ে এক অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে ফিলিস্তিন। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দাওয়াতের কার্যক্রম একেবারে শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনে। তবে ৪৬৩ হি: সুলতান আল্প আরসালানের নির্দেশে

তুর্কি সেনাপতি আতসিয ইবনে উবাক উবায়দিয়াদের হাত থেকে ফিলিস্তিনিদের উদ্ধার করে। কিন্তু সামান্য ভুলের কারণে ৪৮৯ হি: উবায়দিয়ারা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং ফিলিস্তিন দখল করে।

ক্রুসেডার শাসন : ৪৯০ হিজরি/১০৯৭ ঈসাব্দে উবায়দিয়াদের শাসন আমলে ধেয়ে আসে ক্রুসেডাররা। ক্রুসেডাররা পাঁচটি বাহিনী ফ্রান্স থেকে কন্সটান্টিনোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়।ক্রুসেডাররা প্রথমে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে। তারা খুব সহজে কিলিজ আরসালানকে পরাজিত করে।

দ্বিতীয় পোপ আরবান ক্রসেডরদের উদ্দেশে এক জালাময়ী বক্তৃতা দেয়। যা সমগ্র ইউরোপে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে আবেগী কণ্ঠে বলে ‘মহামতি মসিহের সমাধি মুসলমানদের থেকে উদ্ধার করতে হবে। তাদের হাত থেকে আল কুদসকে পবিত্র করতে হবে’। যার ফলে পিটার আন নাসিক এর নেতৃত্বে ৪৯২ হিজরী/৭ জুন ১০৯৯ ঈসাব্দে ক্রুসেডাররা আলকুদসে পৌঁছে। পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত অনবরত আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। ২০ শাবান ৪৯২ হিজরী/১৫ জুন ১০৯৯ ঈসাব্দে আলকুদসের পতন ঘটে। ক্রুসেডাররা ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে। ৭০ হাজার মুসলমানকে জবাই করে। পবিত্র শহরে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। ইহুদীদেরকে গির্জায় একত্রিত করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।ক্রসেডারদের শাসনামলে বাইতুল মাকদিস ছিল ল্যাটিন সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে। ক্রুসেডাররা ৫৬৫(হি.) পর্যন্ত প্রায় অর্ধশত বছর ফিলিস্তিন শাসন করে।

ফিলিস্তিনে সালাহ উদ্দিন আইয়ুবীর (র.) শাসন : মহাবীর সালাহ উদদ্দিন আইয়ুবীর সঙ্গে ১৫ রজব ৫৮৩ হিজরিতে ক্রসেডারদের এক রক্তক্ষয়ী যদ্ধু সংঘটিত হয়। যা ইতিহাসে হিত্তিনের যদ্ধু নামে পরিচিত। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী টানা ১২ দিন মিনজানিক দিয়ে অব্যাহত আক্রমণ করে যান। হামলার ভয়াবহতা দেখে ক্রুসেডাররা শান্তি প্রস্তাব করে। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীতে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, বাইতুল মাকদিস হস্তান্তরের পর জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। ২৭ হিজরী রজব মাসে আলকুদস শহরে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়।

ক্রসেডররা আল মসজিদুল আকসাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে। এক ভাগ বানানো হয় গির্জাঘর। দ্বিতীয় ভাগকে বানানো হয় সৈন্যদের কোয়াটার। তৃতীয় ভাগকে বানানো হয় স্টোর রুম। আরেক ভাগকে পরিণত করা হয় ঘোড়ার আস্তাবল। ক্রুসেডাররা মসজিদে আকসাকে এতটাই অপরিচ্ছন্ন করেছিল যে, তা পরিষ্কার করতে এক সপ্তাহ লেগে যায়। অতঃপর তারা সবাই আল মাসজিদুল আকসায় শুকরিয়ার নামাজ আদায় করেন। ২৭ সফর ৫৮৯ হিজরীতে

মহাবীর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ইন্তেকাল করেন। ৫৮৩ হিজরি থেকে নিয়ে ১৩৩৫ হিজরি পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসে চলে মুসলমানদের সোনালি যুগ।

উসমানী শাসন(১৫১৭-১৯২৪): মামলুক সাম্রাজ্যের শেষের দিকে উসমান ইবনে আরতুগ্রুল এর হাত ধরে উসমানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সম্রাজ্য স্থায়ী হয় সবকিছু মিলিয়ে ৬৪৩ বছর পর্যন্ত। ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে মার্চ দাবীক ময়দানে ওসমানী ও মামলুক বাহিনীর মাঝে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ওসমানী সুলতান প্রথম সেলিম বিজয়ী হন এবং মামলুক বাহিনী পরাস্ত হয়। এ বিজয়ের পর সুলতান সেলিম একে একে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লেবানন জয় করে নেন।আর এভাবেই ফিলিস্তিন ওসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ফিলিস্তিনের পতনের সূচনা: ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এই দেশটি ওসমানী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং সেখানে জন্ম নেয় ইহুদীবাদী ইসরাইল। আর সেখান থেকেই ফিলিস্তিনের পতনের সূচনার বীজ রোপিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ফিলিস্তিন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফিলিস্তিন ব্রিটিশ বিরোধী জোটে ছিল।১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোর বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হলে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার চুক্তিতে যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের সহযোগিতা কামনা করে? যা ইতিহাসে ‘বেলফোর ঘোষণা’ হিসেবে পরিচিত?অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন বিজয়ী হওয়ার পর ফিলিস্তিনকে স্বাধীনতা দেওয়ার নামে ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ৩০ বছর দেশটিকে নিজেদের শোষণের অধীনে রাখে? যা ছিল ফিলিস্তিনকে আরব বিশেষত মুসলিম শূন্য করার এক অভিনব প্রক্রিয়া।

মুসলমানদের উচ্ছেদকরণ:

১৯২০ সাল। বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশবিরোধী শক্তিগুলো পরাভূত। অপর দিকে ফিলিস্তিনিরা স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়ার আশায় ক্ষণ গুনে গুনে তদবির চালাচ্ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা মুসলমানদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে ‘জাতিপুঞ্জ’ ঘোষণার মাধ্যমে ম্যান্ডেটরি প্যালেস্টাইন প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে বিভিন্নদেশে বসবাসরত ইহুদিরা দলে দলে ফিলিস্তিন আসতে শুরু করে এবং ইহুদিবাদী তিনটি প্রধান সংগঠন হাগানাহ, ইরগুন ও স্ট্যার্ন গ্যাং ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় মুসলিম নারী-পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ ও বাড়িতে বাড়িতে লুটতরাজ চালায়। যাতে করে আরবীয়রা ফিলিস্তিন ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়।

ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা:

জাতিসংঘের রায়ের পর আরবীয়রা গাজা নামক শহরের উপকণ্ঠ উত্তর-দক্ষিণে বসবাস শুরু করে। আর ইহুদিরা ফিলিস্তিনের উত্তর-পশ্চিমে বসবাস করতে শুরু করে।প্রধান দাভিদ বেন গুরিয়নকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে ১৯৪৮ সালের ১২ মে রাত ১২টা এক মিনিটে ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। ওই রাতের ১২:১০ মিনিটেই যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেনসহ অন্যান্য দেশ ধাপে ধাপে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান করে। আর এভাবেই দখলদার ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেনো এতো গুরুত্বপূর্ণ

মসজিদুল আকসা:

ফিলিস্তিনের জেরুসালেমে অবস্থিত মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস।মক্কা-মদিনার পর সম্মানের কাতারে রাখা হয় এই মসজিদকে। মসজিদুল আকসা মুসলমানদের কাছে তৃতীয় পবিত্রতম স্থান।

মহানবী (ﷺ) বলেন, "তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন স্থান যিয়ারতের জন্য সফর করা যাবে না; মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা ও আমার এই মসজিদ (নববী)।" (বুখারী,মুসলিম, সহীহ মিশকাত ৬৯৩)

মসজিদুল আকসা বা বাইতুল মুকাদ্দাস হলো পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় মসজিদ।

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ قَالَ " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ " . قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " الْمَسْجِدُ الأَقْصَى " . قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ " أَرْبَعُونَ سَنَةً وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ " . وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ " ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّهْ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ " .

আবূ যর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! পৃথিবীতে কোন মসজিদটি সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি (মাসজিদটি)। তিনি বললেন, আল মাসজিদুল আকসা বা বায়তুল মাকদিস। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, এ দু'টি মসজিদের নির্মাণকালের মধ্যে ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তিনি আরো বললেন) যে স্থানেই সালাতের সময় উপস্থিত হবে, তুমি সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। কারণ সে জায়গাটাও মাসজিদ।

আবূ কামিল বর্ণিত হাদীসে আছে, তাই যেখানেই সালাতের সময় হবে তুমি সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। কারণ সেটিও মাসজিদ। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১০৪২, ইসলামিক সেন্টার ১০৫২)

মসজিদুল আকসাকে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বরকতময় ভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদার ২১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِين َ

‘হে আমার কওম, তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন এবং তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যেয়ো না, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে’। (সূরা মায়েদা, (৫), আয়াত, ২১)

পবিত্র কোরআনের সূরা আম্বিয়াতেও আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

আমি তাঁকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি। (সূরা আম্বিয়া, (২১), আয়াত, ৭১)

পবিত্র কোরআনের সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে,

وَ اَوۡرَثۡنَا الۡقَوۡمَ الَّذِیۡنَ کَانُوۡا یُسۡتَضۡعَفُوۡنَ مَشَارِقَ الۡاَرۡضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِیۡ بٰرَکۡنَا فِیۡهَا ؕ وَ تَمَّتۡ کَلِمَتُ رَبِّکَ الۡحُسۡنٰی عَلٰی بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ ۬ۙ بِمَا صَبَرُوۡا ؕ وَ دَمَّرۡنَا مَا کَانَ یَصۡنَعُ فِرۡعَوۡنُ وَ قَوۡمُهٗ وَ مَا کَانُوۡا یَعۡرِشُوۡنَ

আর আমি দুর্বল করে রাখা লোকেদেরকে সেই যমীনের পূর্বের আর পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম যাতে আমি কল্যাণ নিহিত রেখেছি। এভাবে বনি ইসরায়েলের ব্যাপারে তাদের ধৈর্য ধারণের কারণে তোমার প্রতিপালকের কল্যাণময় অঙ্গীকার পূর্ণ হল আর ফেরাউন ও তার লোকজনের গৌরবময় কাজ ও সুন্দর প্রাসাদগুলোকে ধ্বংস করে দিলাম। (সূরা আরাফ, (৭), আয়াত, ১৩৭)

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা সাবাতেও মসজিদুল আকসাকে পবিত্র ও বরকতময় বলেছেন। বর্ণিত হয়েছে,

وَ جَعَلۡنَا بَیۡنَهُمۡ وَ بَیۡنَ الۡقُرَی الَّتِیۡ بٰرَکۡنَا فِیۡهَا قُرًی ظَاهِرَۃً وَّ قَدَّرۡنَا فِیۡهَا السَّیۡرَ ؕ سِیۡرُوۡا فِیۡهَا لَیَالِیَ وَ اَیَّامًا اٰمِنِیۡنَ

আর তাদের ও যেসব জনপদের মধ্যে আমি বরকত দিয়েছিলাম, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে আমি দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ওই সব জনপদে ভ্রমনের যথাযথ ব্যবস্থা

করেছিলাম। বলেছিলাম, তোমরা এসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিনে ও রাতে। (সূরা সাবা, (৩৭), আয়াত, ১৮)

এক আমলে হাজার আমলের সওয়াব,

মাইমুনা বিনতে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে আমাকে ফতোয়া দিন। তিনি বলেন, এটা হাশরের মাঠ এবং সকলের একত্র হওয়ার ময়দান। তোমরা তাতে নামাজ আদায় করবে। কেননা সেখানে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়া অন্যান্য স্থানের তুলনায় এক হাজার গুণ উত্তম। আমি বললাম, আপনি কি মনে করেন, যদি আমি সেখানে যেতে সমর্থ না হই? তিনি বলেন, তুমি তাতে বাতি জ্বালানোর জন্য জলপাইয়ের তেল হাদিয়া পাঠাও। যে ব্যক্তি তা করল, সে যেন সেখানে উপস্থিত হলো। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৪০৭)

সত্যের পথে সংগ্রামের ভূমি :

আল্লাহ ফিলিস্তিন ভূমিকে সত্যের পথে সংগ্রামের দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমার উম্মতের একটি দল দামেস্কের প্রবেশপথগুলোতে এবং তার আশপাশে সংগ্রাম করতে এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বদা (সত্যের পক্ষে) সংগ্রামরত থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের শত্রুরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' (মুসান্নাফে আবি ইয়ালা, হাদিস : ৬৪১৭)

মুসলমানদের প্রথম কিবলা: মুসলিমদের প্রথম কিবলা ছিলো মসজিদুল আকসা। আল্লাহ তায়ালা যখন রসূল (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর ওপর সালাত ফরজ করেছেন, তখন বায়তুল মাকদিস এর দিকে ফিরেই প্রথমে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। রসূল (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মদিনায় হিজরত করার পর ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত একই ভাবে তারা মসজিদে আকসার দিকে ফিরেই সালাত আদায় করতেন।

ফিলিস্তিনে বসবাসকারী বিভিন্ন নবী ও রাসূল

ফিলিস্তিন অসংখ্য নবী রাসুলের পূণ্যভূমি। হিজরতের ভূমি। মহান আল্লাহর বরকতের ভূমি। এজন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ ভূমিতে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী-রাসুল। মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর পর সবচেয়ে দামি মসজিদ সেখানেই অবস্থিত। মসজিদুল আকসা। ফিলিস্তিন নিজের বুকে যতজন নবী-রাসুল ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, পৃথিবীর অন্য কোনো ভূমি সেটা পারেনি। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম আ. থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত প্রায় সব নবী এ ভূমিতেই এসেছিলেন।

ফিলিস্তিনে **হযরত ইবরাহিম আ.**-এর হিজরত:

মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম খলিলুল্লাহ। ইরাকের বাবেল শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহর একত্ববাদের পয়গাম পৌঁছাতে গিয়ে অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হন তিনি। এক আল্লাহর ইবাদতের অপরাধে তার বাবা তাকে দেশান্তরিত করার হুমকি দেয়। কুরআনে এসেছে,

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

পিতা বললঃ যে ইব্রাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।(সুরা মারইয়াম, আয়াত নম্বর ৪৬)

ঈমান রক্ষায় স্ত্রী সারা, ভাতিজা লুতসহ প্রথমে হাররান, সেখান থেকে হালবে তারপর ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে হিজরত করেন ইবরাহিম আ.।ফিলিস্তিনেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। জেরুজালেমেই তাকে সমাহিত করা হয়।

ফিলিস্তিন **ইসমাঈল আ.**-এর জন্মস্থান:

বাইতুল মুকাদ্দাসে হিজরতের পর দীর্ঘ ২০ বছর নিঃসন্তান থাকেন ইবরাহিম আ.। বিবি সারা ইবরাহিম আ. কে বললেন, আল্লাহ আমাকে সন্তান দেননি। আপনি আমার দাসী হাজেরাকে বিয়ে করেন। হতে পারে আল্লাহ তার থেকে সন্তান দান করবেন। হাজেরার গর্ভে ফিলিস্তিনে ইসমাঈল আ. জন্মগ্রহণ করেন ।এরপর আল্লাহর আদেশে শিশু ইসমাঈলসহ হাজেরাকে মক্কায় রেখে আসেন। কোরআনে আল্লাহ বলেন,

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (সুরা ইবরাহিম, আয়াত নম্বর ৩৭)

ইসহাক আ.-এর জন্মভূমি ফিলিস্তিন:

হযরত ইবরাহিম আ.-এর দ্বিতীয় ছেলে ইসহাক আ.। স্ত্রী সারার গর্ভ থেকে ইসহাক আ.-এর জন্মের সুসংবাদ এমন সময় পেয়েছেন, যখন উভয়ে শেষ বয়সে উপনীত হন। যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ইবরাহিম আ. বলেন

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে এই বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন। (সুরা ইবরাহিম, আয়াত নম্বর ৩৯)

ফিলিস্তিনে **নবী লুত আ.**-এর বসবাস:

হযরত লুত আ.-এর বসবাস ছিলো ফিলিস্তিনে। তিনি ইবরাহিম আ.-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তার সঙ্গে ফিলিস্তিনে হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীতে ইবরাহিম আ.-এর পরামর্শে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকা সাদুম ও আমুরায় চলে যান। ঐহিতাসিকদের বর্ণনা মতে যা বর্তমান মৃত সাগর ও তার তীরবর্তী এলাকা। সেখানকার লোকেরা নিকৃষ্ট ও ঘূর্ণিত স্বাভাবের ছিলো। তারা সমকামিতায় আসক্ত ছিলো।

কোরআনে আল্লাহ বলেন,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি ?

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।

(সুরা আরাফ, আয়াত নম্বর ৮০, ৮১)

এ ঘৃণিত অপরাধের কারণে সাদুম ও আমুরাবাসীর ওপর আসমানি গজব নেমে আসে। আল্লাহর হুকুমে লুত আ. পাশ্ববর্তী পাহাড়ে চলে যান। মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে বসবাস করেন।

ইয়াকুব আ.-এর মাতৃভূমি ফিলিস্তিন:

ইয়াকুব আ. যার অপর নাম ইসরাঈল। তিনি ইসহাক আ. ছেলে। ইবরাহিম আ. এর নাতি। জন্ম ফিলিস্তিনে। শেষ বয়সে মিশরে হিজরত করেছিলেন তিনি। সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। মিশরেই তাকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি সন্তানদের ওয়াসিয়ত করেছিলেন, মিশর ত্যাগকালে তার লাশ যেন ফিলিস্তিনে নিয়ে যাওয়া হয়। ওয়াসিয়ত অনুযায়ী তার লাশ ফিলিস্তিনে নিয়ে আসা হয়। ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি বাইতুল মুকাদ্দাসে সমাহিত করা হয়

ইউসুফ আ.-এর শৈশব কাটে ফিলিস্তিনে:

আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আ.। যার ঘটনাকে কোরআন আহসানুল কাসাস বলেছে। তিনি হযরত ইয়াকুব আ.-এর ছেলে। দক্ষিণ ইরাকের ফাদ্দান আরামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এরপরই পিতা ইয়াকুব আ.-এর সঙ্গে ফিলিস্তিনে চলে আসেন। শৈশবের কিছুদিন ফিলিস্তিনেই কাটে তার। ছোটবেলায় তিনি ভাইদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। পরে নবুয়াত লাভ করার পর মিশরের মন্ত্রী হন।

নিজের পিতা ও ভাইদের মিশর নিয়ে আসেন। মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তবে মৃত্যুকালীন ওয়াসিয়ত অনুযায়ী তার লাশকেও ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে স্থানান্তরিত করা হয়।

আল্লাহর নবী ও ফিলিস্তিনের বাদশাহ **দাউদ আ.:**

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে ছিলাম। (সুরা সাবা আয়াত নম্বর ১০)

নবুয়াত লাভের আগে তিনি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে তালুতের দলে যুদ্ধে শরিক হন। অত্যাচারী বাদশাহ জালুতকে তিনি হত্যা করেন। আসদুদ, বাইতে দুজান, আবু গাওস, বাইতুল মুকাদ্দাস ও রামলার শাসক ছিলেন তিনি। ফিলিস্তিনেই ইন্তেকাল করেন। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রামলাগামী পথের ডানপার্শ্বে একটি পাহাড়ে তাকে সমাহিত করা হয়।

হযরত সুলাইমান আ.-এর মাতৃভূমি ফিলিস্তিন:

হযরত সুলাইমান আ. হযরত দাউদ আ.-এর ছেলে। আল্লাহর নবী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোটা পৃথিবী শাসনকারী শাসকদের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা পশু-পাখি, বায়ুমণ্ডল ও জিন জাতিকে তার অধীন করে দিয়েছিলেন। এই মহান নবীর জন্ম, বসবাস সবই ছিলো ফিলিস্তিন কেন্দ্রিক। তিনি ঐতিহাসিক বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদের নির্মাতা। খ্রিষ্টপূর্ব ৯২৩ সালে ফিলিস্তিনে ইন্তেকাল করেন। বাইতুল মুকাদ্দাসে তাকে দাফন করা হয়।

ইয়াহইয়া আ.-এর জন্মস্থান ফিলিস্তিন:

আল্লাহর আরেক নবী হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর জন্ম লিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে। হযরত জাকারিয়া আ.-এর দোয়ায় আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধ বয়সে দান করেন ছেলে ইয়াহইয়া আ.-কে। তার মর্যাদা, তাকওয়া, জনপ্রিয়তা ও আল্লাহর দিকে আহ্বান-এর কারণে তিনি ইহুদিদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। যার কারণে বাইতুল মুকাদ্দাসের ভেতরে তাকে শহিদ করা হয়।

কিয়ামতের আগে **ঈসা আ.** ফিলিস্তিনেই নেমে আসবেন:

ঈসা ইবনে মারইয়ামের জন্ম ফিলিস্তিনের বাইতুল লাহামে। যিনি পিতা ব্যতীত আল্লাহর কুদরতের সাক্ষী হিসেবে দুনিয়াতে আগমন করেন। তিনি দোলনায় থাকাবস্থায় নিজের নবুওয়াতের ঘোষণা দেন। মায়ের সতীত্বের সাক্ষ্য দেন। কোরআনে আল্লাহ বলেন,

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

মরিইয়াম বললঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না

قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا

সে বললঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।

(সুরা মারইয়াম, আয়াত নম্বর ২০ ও ২১)

তিনি ফিলিস্তিন অঞ্চলে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করেন। মায়ের সঙ্গে মিশরেও গমন করেছিলেন তিনি। সেখান থেকে আবার ফিলিস্তিনে চলে আসেন। অভিশপ্ত ইহুদিরা তাকে জারজ সন্তান ও তার মাকে দুশ্চরিত্রা বলে অপবাদ দেয়। তিনি তাদের বিপক্ষে আল্লাহর কাছে বদ দোয়া করেন। আল্লাহর গজব নেমে আসে ইহুদিদের উপর। তখন তারা ঈসা আ.

কে হত্যার পরিকল্পনা করে। আল্লাহ তাআলা তাকে নিজ কুদরতে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। কিয়ামতের আগে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে নেমে আসবেন। দাজ্জাল কে হত্যা করবেন। ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এরপর তার মৃত্যু হলে নবীজির রওজার পাশে সমাহিত হবেন।

ইসরা ও মেরাজ: ইসরা হচ্ছে, মক্কা মুকাররমা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণের সেই পর্বটুকু, যা রাতের একটি অংশে সংঘটিত হয়েছিল। আর মিরাজ হচ্ছে সেখান থেকে ঊর্ধ্বজগৎ পরিভ্রমণের সেই বিস্তৃত অধ্যায়।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক রাতে সশরীরে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে সাত আসমান, সিদরাতুল মুনতাহা, জান্নাত, জাহান্নাম ভ্রমণ করিয়েছেন; আল্লাহ তাআলা স্বীয় বড় বড় কিছু কুদরত প্রিয় হাবীবকে দেখাবেন বলে। মিরাজ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ মুজিযা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে দুই রাকাত নামাজ পড়েন। আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য নবী রাসুলগণকে অলৌকিকভাবে সেখানে হাজির করেছিলেন এবং তিনি সব নবী রাসুলগণের ইমামতি করেছিলেন।

সূরা বনি ইসরায়েলের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ ﴿۱﴾

পবিত্র মহিমাময় তিনি, যিনি তার বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করালেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত যার আশপাশকে আমি করেছি বরকতময়, যেন আমি তাকে আমার নিদর্শন দেখাতে পারি; তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (সূরা বনি ইসরায়েল, (১৭), আয়াত, ১)

আল্লাহ তাআলা সূরা নাজমে আরো বলেন-

وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى، اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى،مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى، لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى.

বস্তুত সে তাকে (হযরত জিবরাঈল আ.-কে) আরও একবার দেখেছে। সিদরাতুল মুনতাহা (সীমান্তবতীর্ কুলগাছ)-এর কাছে। তারই কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া। তখন সেই কুল গাছটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই জিনিস, যা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। (রাসূলের) চোখ বিভ্রান্ত হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। (অর্থাৎ দেখার ব্যাপারে চোখ ধেঁাকায় পড়েনি এবং আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তিনি তা লংঘনও করেননি যে, তার সামনে কী আছে তা দেখতে যাবে।) বাস্তবিকপক্ষে, সে তার প্রতিপালকের বড়-বড় নিদর্শনের মধ্য হতে বহু কিছু দেখেছে। -সূরা নাজম (৫৩) : **১৩-১৮**

ফিলিস্তিনে হামাস

১৯৮৭ সালে আহমেদ ইয়াসিন ও আব্দেল আজিজ আল-রানতিসি প্রতিষ্ঠা করেন হামাস। হামাস হচ্ছে, হারকাত আল-মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়া- এর সংক্ষেপ, যার অর্থ ইসলামি নবজাগরণের আন্দোলন। হামাসের দু'টি সংগঠন রয়েছে। এর একটি সাংস্কৃতিক, যার নাম দাওয়াহ। আর অপর সামরিক শাখার নাম ইজ্জ আদদ্বীন আল-কাসসাম ব্রিগেডস।১৪-১২-১৯৮৭ সালে হামাসের আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয় যা আজও চলমান। তারা মুক্তিকামী যোদ্ধা।

বর্তমান অবস্থা

ফিলিস্তিনের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং সংকটপূর্ণ। বিশেষ করে গাজা উপত্যকায়, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেছে। ইজরায়েল গাজায় আমাদের মুসলিম ভাই বোনদের উপর হত্যাযোগ্য চালাচ্ছে। পুরুষদের,শিশুদের, নারীদের, বৃদ্ধদের হত্যা করা হচ্ছে। তারা মারা যাচ্ছে বুলেটের আঘাতে বোমার আঘাতে, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে শ্বাসরুদ্ধভাবে, জ্যান্ত আগুনে পুড়ে, চিকিৎসার অভাবে, ওষুধের অভাবে, অনাহারে। বাসা বাড়ি থেকে শুরু করে হসপিটাল, ইউনিভার্সিটি, রিফিউজিক্যাম্প সব জায়গাতে ইহুদিরা আক্রমণ করতেছে।

পৃথিবীর টপ মেডিকেল জার্নাল (The Lancet) সেটা বলছে গাজায় প্রায় 2 লক্ষ মানুষ মারা গেছে। কিন্তু এই সংখ্যা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না কারণ লাশগুলো ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে।

"ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস" (International Court of Justice বা ICJ) তারা বলছে গাজায় যেটা হচ্ছে সেটা গণহত্যা হিসেবে কোয়ালিফাই করতে পারে।

এর পরেও কেও কিছুই করছে না। আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, জাতিসংঘ কেও কিছুই করে নাই।আর পশ্চিমা বিশ্ব আমেরিকা, ইউরোপ তারা সক্রিয়ভাবে এই গণহত্যার মদদ দিচ্ছে। তারা ইসরাইলকে অস্ত্র দিচ্ছে, ফিনান্সিয়ালি ভাবে সাহায্য করছে এবং কূটনৈতিকভাবে সাহায্য করছে।

আর মুসলিম বিশ্বের শাসকদের অবস্থা হল তারা একদিকে কিছু বিবৃতি দিচ্ছে অন্যদিকে তলে তলে তারা ইসরাইলের সাথে নরমালাইজ করতেছে। এটাই হলো বাস্তবতা।

আমাদের করণীয়

আল-উখুওয়াহ ইসলামিয়া বা মুসলিম ভাতৃত্ব সেটা আমাদের অন্তরের অন্তরস্থল এর গহীন থেকে গেঁথে নিতে হবে। আজকে আমাদের মধ্যে এটির প্রচন্ড অভাব চলছে। একজন মুমিন অপর মুমিনের প্রতি সম্প্রীতি-ভালবাসা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করবে, তা সে যে দেশের হোক, যে ভাষারই হোক। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ.ْ

মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করে দাও। -সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسّهَرِ وَالْحُمّى.

সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত এক দেহের ন্যায়, যার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ জ¦র ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০১১; সহীহ মুসলিম, হদীস ২৫৮৬

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ.ِ

মুমিন মুমিনের জন্য আয়না। মুমিন মুমিনের ভাই। সে তার জমি সংরক্ষণ করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে হেফাযত করে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯১৮

আমরা আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসার জায়গা থেকে যদি ফিলিস্তিন এর মুসলমানদের কষ্টটা উপলব্ধি করি , (ফিলিস্তিনের যে সমস্যা সেটা আসলে ফিলিস্তিনের সমস্যা না, এটা পুরো বিশ্বের মুসলমানদের সমস্যা । কারণ সেখানে যে মসজিদ কে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলে আসছে, সেটিকে দখল করাকে কেন্দ্র করে, সেটা গোটা বিশ্বের মুসলমানদের সম্পদ।

সেটা মুসলমানদের প্রথম কেবলা। যেখানে গোটা বিশ্বের মুসলমানদের স্বার্থ জড়িত আছে।) সেই জায়গা থেকে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য প্রকৃত অন্তরের ভালোবাসা ভ্রাতৃত্ব আমাদের মধ্যে যদি থাকে তাহলে আমাদের করণীয় আমরা খুব সহজেই বের করে নিতে পারব।

দোয়া করা: আল্লাহ তাআলার কাছে ফিলিস্তিনের ভাইবোনদের জন্য চোখের পানি ফেলে বেশি বেশি দোয়া করা । আল্লাহ তায়ালা তাদের দুর্দশা দূর করুন, তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিন, এবং তাদেরকে শক্তি ও সাহস দিন। তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিন এবং তাদের সর্বাত্মক সাহায্য করুন।

ইন্নাল্লাহু মাআ'না (আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন)।

ইসরাইলি পণ্য বয়কট: ইসরায়েলি পণ্য বয়কট একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ব্যবস্থা, যা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন প্রকাশের একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, বয়কটের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ফিলিস্তিনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

আমাদের করণীয় এ বিষয়ে আরো কিছু প্রস্তাবনা:

আন্তর্জাতিক সহায়তা বৃদ্ধি: ফিলিস্তিনে মানবিক সহায়তা পাঠানো এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই সংকটের সমাধানে আরো সক্রিয় করতে আমাদের ভূমিকা থাকতে পারে। বিভিন্ন সংস্থা এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সেখানে চিকিৎসা, খাবার, আশ্রয় এবং অন্যান্য জরুরি সহায়তা পৌঁছে দেওয়া জরুরি।

নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন: ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং ন্যায়সঙ্গত দাবি সমর্থন করা গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা, মানুষের অধিকার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা যেতে পারে।

শান্তি প্রচেষ্টা সমর্থন: যেহেতু এই সংকটের মূল কারণ রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক, আমাদের সরকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সহায়তা করা

উচিত। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান বা শান্তি আলোচনা এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

বিজ্ঞপ্তি এবং সচেতনতা সৃষ্টি: সমাজে ফিলিস্তিনের সংকট সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং সঠিক তথ্য বিতরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে আলোচনা, মতবিনিময় এবং সহমর্মিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবিক অবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব।

অর্থনৈতিক সহায়তা এবং বাণিজ্য: ফিলিস্তিনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে অর্থনৈতিক সহায়তা, বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ফিলিস্তিনের বর্তমান সংকট একটি মানবিক দুর্দশা, এবং এই সমস্যা সমাধানে সকলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের নিয়মতান্ত্রিক, অনুমোদিত, বৈধ কোন সমাধান নাই। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার যতগুলো নিয়মতান্ত্রিক, বৈধ, অনুমোদিত পথ আছে এগুলোর কোনটা দিয়েই ফিলিস্তিন মুক্ত হবে না। আর যে পথে বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত হবে তা কোনদিনও এই বিশ্ব ব্যবস্থায় বৈধ পথ হবে না। এটা সব সময় তাদের কাছে অবৈধ হবে, এটা তাদের চোখে সন্ত্রাস হিসেবে গণ্য হবে। যে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে ইজরাইলের প্রতিষ্ঠা হলো সেই জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক আইন দিয়ে কিভাবে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করা সম্ভব। এই বিশ্ব ব্যবস্থা ইসরাইলকে জন্ম দিয়েছে আর এই বিশ্বব্যবস্থায়ী ইজরায়েলকে টিকিয়ে রেখেছে। এই বিশ্ব ব্যবস্থার অধীনে যতগুলো সম্ভাব্য সমাধান আছে, তার কোনটা দিয়েই ইসরাইলকে সরানো সম্ভব নয়। তথাকথিত আন্তর্জাতিক আইন মানবাধিকার এগুলো মেনে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করা সম্ভব নয়। কারণ এগুলো হলো আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক কিন্তু তাদের জন্য নয় । ইসরাইল কতগুলো মানবাধিকার ভঙ্গ করছে, কতগুলো আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছে কিন্তু এগুলোর ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই।

জিহাদ: বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় হবে জিহাদের মাধ্যমে কিতালের মাধ্যমে তরবারির মাধ্যমে। তরবারির ধারালো অগ্রভাগ দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দেস বিজয় হবে তাছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে হবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।

(সূরা নিসা আয়াত ৭৫-৭৬)

তথ্যসূত্র: আলকাউসার, আলোকিত বাংলাদেশ, উইকিপিডিয়া, সময়, ইনকিলাব, অন্যান্য